যুগান্তর

তারিখ 30 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিমল সরকার

অবারিত উচ্চশিক্ষা, সংকুচিত শিক্ষার মান

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান) অনার্স পড়ানো হয় এমন কলেজ ছিল হাতেগোনা কয়েকটি। ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনের পর ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশে এ ধরনের কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ অথবা ২২-এ। সুদীর্ঘ ২০ বছর পর ১৯৯২ সাল নাগাদ অনার্স পাঠদানোপযোগী কলেজের সংখ্যা আরও দু'-চারটি বৃদ্ধি পায়। চাহিদা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করেই মূলত '৯০-এর দশকের প্রথমার্ধে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। এ সময় থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কলেজে অনার্স কোর্স খোলারও হিড়িক পড়ে যায়। সঠিক সংখ্যাটি এ মুহূর্তে জানা না থাকলেও অনার্স কোর্স চালু আছে এমন কলেজের সংখ্যা বর্তমানে পাঁচশ'র বেশি বলে আমার ধারণা।

যুগান্তরে আগে একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলাম— বৃহত্তর ময়মনসিংহে (টাঙ্গাইলসহ) প্রথম অনার্স কোর্স খোলা হয় ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে, ১৯৬৪ সালে। বাংলা ও ইতিহাস বিষয়ে যথাক্রমে ৫ জন ও ১৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ওই কলেজে অনার্স কোর্সের পথচলা শুরু। পরের বছর ১৯৬৫ সালে বলতে গেলে একই গতিতে টাঙ্গাইলের সা'দত কলেজেও অনার্স পড়ার ব্যবস্থা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর কলেজ দুটিতে ২-৩টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্সও চালু করা হয়। পরবর্তীকালে টানা ২০ বছর (১৯৭৩-১৯৯৩) পর্যন্ত এ অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর) আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনার্স বা মাস্টার্স পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কলেজ পর্যায়ে অনার্স বা মাস্টার্স কোর্স চালুর চিত্রটি সারা দেশে বলতে গেলে এরূপই ছিল। ফলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২২ বছরে যেখানে সারা দেশে মোট ২৫-২৬টি কলেজে অনার্স কোর্স চালু ছিল, সেখানে মাত্র ৫-৬ বছরের ব্যবধানে ১০০-এর মতো কলেজে অনার্স চালু হয়ে যায়। একইভাবে বাড়তে থাকে মাস্টার্স কোর্সে পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠানও। এখন এমন কোনো জেলা নেই, যেখানে ৫-৭টি কিংবা ১০-১২টি, এমনকি এরও বেশিসংখ্যক কলেজে অনার্স কোর্স চালু নেই। উপজেলায় উপজেলায়, এমনকি অনেক প্রত্যন্ত গ্রামের কলেজেও আজকাল অনার্স পড়তে ও পড়াতে দেখা যায়। যেখানে-সেখানে হঠাৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনকে যেমন সহসা ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তেমনি অজ্ঞাত অখ্যাত কলেজগুলোয় অনার্স কোর্স চালুর বিষয়টিকেও ইদানীং অনেকে 'পুকুরে পাঙ্গাশ মাছ' চাষের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১২ সালে (২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে) একসঙ্গে এর অধিভুক্ত শ'খানেক কলেজে অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেয়। প্রথম বর্ষ অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মেধা তালিকা অনুযায়ী বিখ্যাত বা অপেক্ষাকৃত পুরনো কলেজগুলোয় প্রথমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর কলেজে কলেজে তাদের ক্লাসও শুরু করা হয়। ওই সব কলেজে ভর্তির জন্য মেধা তালিকা অনুযায়ী (প্রথম মেধা তালিকা, দ্বিতীয় মেধা তালিকা ইত্যাদি) যারা বিবেচিত হয় না, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দুই মাস, তিন মাস, এমনকি এরও বেশি সময় ধরে 'প্রথম ভর্তি রিলিজ-স্লিপ', 'দ্বিতীয় ভর্তি রিলিজ-স্লিপ', 'তৃতীয় ভর্তি রিলিজ-স্লিপ' ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন 'অনার্স কলেজগুলোতে' বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেয়। বলাবাহুল্য, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের কোনো বালাই থাকে না। সাধারণত প্রথমে প্রতিটি বিষয়ে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৫০টি আসনের বিপরীতে কোথাও ৫ জন, কোথাওবা ৮ জন কিংবা বড়জোর ২০-২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এক একটি বিষয়ে।

মেধা যাচাইয়ের বালাই না থাকলেও কলেজগুলোতে অধিকাংশ আসনই খালি পড়ে থাকে। মোটকথা, যারা অনার্স পড়ার জন্য মনস্থির করে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, তাদের প্রায় সবাইকে কোনো না কোনো কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাদ্দ দেয়া আসনের অর্ধেকেরও বেশি খালি পড়ে থাকে। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কোনো কলেজে অনার্স চালু করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৭ জন শিক্ষক থাকা

> একটি কথা অধিকাংশ ব্যক্তি, এমনকি শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারকরা পর্যন্ত মানতে চান না যে, উচ্চশিক্ষার দ্বার পৃথিবীর কোনো দেশেই আমাদের দেশের মতো এত উন্মুক্ত নয়। সেসব দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সব সময় প্রাধান্য দেয়া হলেও মেধার বাছবিচার না করে বিপুল জনগোষ্ঠীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার তাগিদটি কেউ অনুভব করেন না।

বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে আগেভাগেই সাফ জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সরকারি কোষাগার থেকে ২ জন (এমপিওভুক্ত) ছাড়া বাকি শিক্ষকদের কোনো টাকা-পয়সা দেয়া হবে না। এমন অবস্থায় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে নতুন কলেজগুলোয় অনার্স পড়ানোর জন্য কেউই আর উৎসাহ দেখান না। ৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, অথচ চাকরির আকালের এই দেশে নিয়োগ পরীক্ষায় দু'-একজনের বেশি প্রার্থী উপস্থিত হন না। এদিকে অনার্স খোলার সময় চলে যাচ্ছে বিধায় মেধার কোনোরকম বাছবিচার না করে অনেকটা কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষক নিয়োগের কাজটি 'কাগজে-কলমে' তড়িঘড়ি সম্পন্ন করা হয়। এজন্য অনেক সময় এনজিওতে চাকরিরত ব্যক্তি কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় সরকারি বিধি অনুযায়ী চাকরিরত শিক্ষকদেরও দ্বারস্থ হতে হয়। এভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কোথাও ২ হাজার, কোথাও ৪ হাজার বা কাছাকাছি অংকের টাকা বেতন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অনেক কলেজে লেকচার হিসাব করেও সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। কেবল অনার্স কোর্সে পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় বলে এমপিওবহির্ভূত এ শ্রেণীর শিক্ষকদের কলেজে কলেজে নামকরণ করা হয়েছে 'অনার্স-শিক্ষক'। নবীন শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে এসে প্রথম প্রথম ৪-৫ জন শিক্ষকের দেখা পেলেও ২-৪ মাসের মধ্যে কেবল এমপিওভুক্ত শিক্ষক ছাড়া বাকিদের পাঠদান বা সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ ছাড়া অনার্স-শিক্ষকদের সম্মানী দেয়া না দেয়া, ক্লাস করা না করা— এমন সব বিষয়কে কেন্দ্র করে কলেজে কলেজে পারস্পরিক মতভেদ তো লেগেই আছে।

গত বছর একটি বা দুটি বিষয়ে অনার্স খোলা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে মাত্র ৬ জন, ১০ জন কিংবা ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। অনার্স উপলক্ষে ৪-৫ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও দু'-একজন ছাড়া বাকিরা কলেজমুখো হন না। ইত্যাকার পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদেরও অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকে। আশ্চর্য, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ব্যাপার হচ্ছে— এমন কলেজগুলো নতুন করে আরও ২টি বা ৪টি বিষয়ে অনার্স খোলার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক বা কর্তাব্যক্তিদের অতি উদার মনোভাবের ফলে তারা কামিয়াবও হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ ধরনের প্রবণতা।

একটি কথা অধিকাংশ ব্যক্তি, এমনকি শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারকরা পর্যন্ত মানতে চান না যে, উচ্চশিক্ষার দ্বার পৃথিবীর কোনো দেশেই আমাদের দেশের মতো এত উন্মুক্ত নয়। সেসব দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সব সময় প্রাধান্য দেয়া হলেও মেধার বাছবিচার না করে বিপুল জনগোষ্ঠীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার তাগিদটি কেউ অনুভব করেন না। আমেরিকার মতো দেশে ৩ হাজারের বেশি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও এবং এক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আনুপাতিক হারে আমাদের মতো এত বিপুলসংখ্যক মাস্টার্স বা অনার্স সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি কিংবা মাস্টার্স বা অনার্স কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সেখানে নেই। ২০ হাজার, ২৫ হাজার, ৩০ হাজার, এমনকি ৪০-৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর একটিমাত্র বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন তাদের কাছে অলীক কল্পনামাত্র। শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস সেসব দেশে ভাবাই যায় না। অথচ সে তুলনায় আমরা কোথায় আছি! ইউরোপ-আমেরিকা তো দূরের কথা, শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গেও কুলিয়ে ওঠা দায় হয়ে পড়েছে। তবে এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবার বাগাড়ম্বর কিংবা আত্মপ্রসাদ লাভের কমতি নেই।

একবার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী এক জায়গায় মন্তব্য করেন, 'এশিয়া তথা গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ, যারা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বর্তমানে ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে জায়গা ও সুযোগ করে দিয়েছে। এসব শিক্ষার্থীকে যদি মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগবে না। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লগ্নে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যাবে বাংলাদেশকে।' তিনি আরও বলেন, 'উচ্চশিক্ষার মানের সঙ্গে কোনো আপস নয়।' কিন্তু কথা হল, শিক্ষার ছাঁচকে কলুষতামুক্ত না করে 'মানসম্মত শিক্ষা' কিংবা 'উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করার' ব্যাপারে এহেন আত্মপ্রসাদ ও আশাবাদ কতটুকু বাস্তবসম্মত সেটাই ভাবার বিষয়।

বিমল সরকার : *কলেজ শিক্ষক*
bimalsarker59@gmail.com